ক্যানসার
চি কি ৎ সা

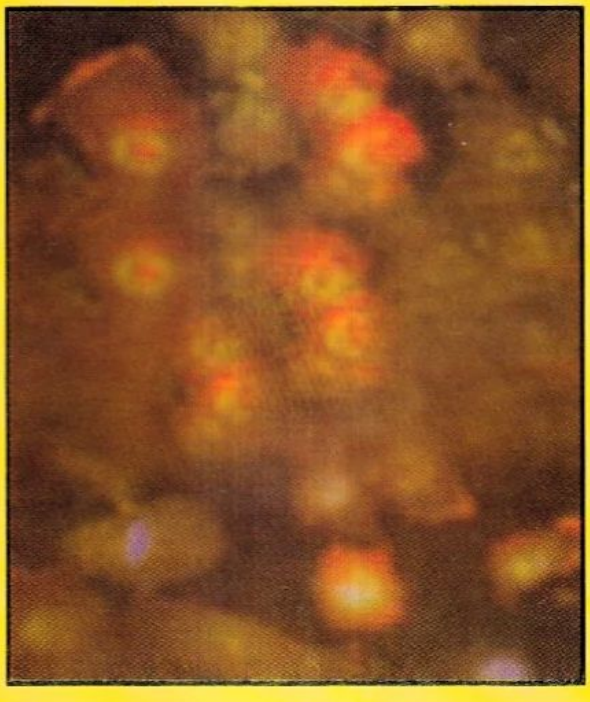

ডাঃ মুহম্মদ আজমাল হোসেন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ
[আরোগ্যের সংকেত]

ক্যানসার ১১
ক্যানসারের প্রকৃতি ১১
ক্যানসারের লক্ষণাবলী ১২
ক্যানসারের বৈশিষ্ট্য ১২
আতঙ্কের ঢেউ ১৩
কারণ তত্ত্ব ১৩
বংশগত প্রবাহ ১৫
চাপা দেওয়ার কুফল ১৫
উত্তেজক কারণ ১৭
কোষের ওপর ১৭
কার সিনোজেনের প্রভাব
পরিপোষক কারণ ১৮
দেহের বিভিন্ন
অংশের ক্যানসার ১৯
ক্যানসারের বিভিন্ন ধাপ ১৯
ক্যানসারের শ্রেণী বিন্যাস ১৯
ক্যানসার
আরোগ্যসাধ্য রোগ ২০
আমরা আশাবাদী ২১
যা দেখা য⁻ ২২
চিকিৎসা⁻ ধারা ২৩
সার্জিক্যা⁻ পদ্ধতি ২৩
বর্তমানে প্রচলিত
ক্যানসারের ঔষধ ২৬

২৭ ক্যানসারের হর্মোন থেরাপি
২৮ ক্যানসারে হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসা
৩১ অভিজ্ঞতার আলোকে
৩১ চিকিৎসার প্রকার ভেদ
৩৫ হোমিওপ্যাথিক লক্ষণ সংগ্রহ
৩৬ লক্ষণের শ্রেণী বিন্যাস
৩৮ ঔষধ নির্বাচন
৪১ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ কী
৪৬ চিকিৎসার ধারা
৫০ বিফলতার কাছাকাছি
৫১ আওতার বাইরে
৫২ ওষুধের শক্তি
৫৩ প্রতিকার আছে
৫৫ সতর্কতা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
[বিভিন্ন অঙ্গের ক্যান্সার]

৫৬ স্তনের ক্যানসার
৫৬ কী করবেন
৫৭ ফুসফুসের ক্যানসার
৫৮ চিকিৎসা
৫৯ মুখ ফ্যারিংকস ও ল্যারিংকস
৬০ একটি ঈস ফ্যাগাসের ক্যানসার
৬১ পাকস্থলীর ক্যানসার
৬৩ কোল্যান ও রেকট্যাস

স্ত্রী জনন অঙ্গ ৬৫
প্রস্টেড ও ব্লাডার ৬৮
ব্লাডারের ক্যানসার ৭০
চামড়ার ক্যানসার ৭১
লিম্ফোমা ৭৩
লিউকিমিঅ্যা ৭৫

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
[ম্যাটিয়্যারইঅ্যা মেডিকা]

অরাম মিউর ৮১
অরাম মেট ৮১
আয়োডিন ৮২
আর্সেনিক আয়োড্ড ৮২
আর্সেনিক অ্যালবাম ৮৩
ইউফরবিয়ম ৮৩
এক্সরে ৮৪
এসটেরিয়াস রিউবেনস ৮৪
কল্ডুরাংগ ৮৪
কার্ব এনিমিলিস ৮৫
কারসিনোসিন ৮৫
কেলি ক্লোরিকাম ৮৬
কেলি ফসফরিকাম ৮৬
কেলি সালফ ৮৬
কোনিয়াম ম্যাকিউলেটাম ৮৭
ক্যাডমিয়াম সালফ ৮৮
ক্যাল আয়োড ৮৮
ক্যাল কার্ব ৮৯
ক্যাল ফ্লুয়োরেটা ৮৯
ক্রিয়োজোট ৯০
ক্লেমেটিস ইরেকটা ৯০
গ্রাফাইটিস ৯১
ট্যারেনটুলা হিস্প্যানীয়া ৯২
থুজা অক্সিডেনটালিস ৯২
নাইট্রিক অ্যাসিড ৯৩
নেট্রাম মিউর ৯৪
পেট্রোলিয়াম ৯৫
ফসফরাস ৯৫
ফাইটো ল্যাকা ৯৬
বেলিস পেরেনিস ৯৬
ব্যারাইটা কার্ব ৯৬
ব্রোমিয়াম ৯৭
মারক্ ভাইভাস ৯৮
মেডোরিনাম ৯৮
ম্যালানড্রিনাম ৯৯
রেডিয়াম ৯৯
র‍্যানান স্কেলে ১০০
লাইকোপোডিয়াম ১০০
ল্যাকেসিস ১০১
ল্যাপিস এলব ১০২
সাইলেসিয়া ১০২
সালফার ১০৩
সিকেলি কর ১০৪
সিপিয়া ১০৫
সিফিলিনাম ১০৫
সিমফাইটাম ১০৬
সিসটাস ক্যান ১০৬
স্টাফি সাগ্রিয়া ১০৭
হাইড্রাসটিস ক্যান ১০৮
হেকলা লাভা ১০৮

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
[রিপার্টটরী]

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
[রোগী-বিবরণী]

একটি জরায়ুর ক্যানসার ১৩৩
একটি স্তনের ক্যানসার ১৩৩
পাকস্থলীর ক্যানসার ১৩৪
ঠোঁটের ক্যানসার ১৩৫
পাকস্থলীর ক্যানসার ১৩৫
ডিম্বকোষের ক্যানসার ১৩৬
একটি স্তনের ক্যানসার ১৩৬
একটি পায়ুর ক্যানসার ১৩৭
একটি জরায়ুর ক্যানসার ১৩৭
একটি স্তনের ক্যানসার ১৩৮
একটি জরায়ুর ক্যানসার ১৩৯
একটি জরায়ুর ফাইব্রোমা ১৪০
একটি গলার ক্যানসার ১৪০
একটি স্তন টিউমারের রোগিণী ১৪১
১৪২ একটি জরায়ুর ফাইব্রয়েড
১৪৪ একটি জরায়ুর ক্যানসার
১৪৫ একটি জিভের ক্যানসার
১৪৬ একটি ইসোফেগাসের ক্যানসার
১৪৬ নাকের এপিথেলিওমা
১৪৭ একটি নাকের ক্যানসার
১৪৭ একটি ডিম্বকোষের ক্যানসার
১৪৮ একটি লিঙ্গের ক্যানসার
১৪৯ একটি হজকিনস ডিজিজের রোগী
১৫০ মাড়ির সারকোমা
১৫১ একটি সন্দেহজনক ক্ষত
১৫১ একটি থ্যালাসেমিয়ার রোগী
১৫৩ একটি জিভের ক্যানসার
১৫৪ জরায়ুর ফাইব্রয়েড
১৫৫ মূত্রথলির ক্যানসার
১৫৫ জরায়ুর ক্যানসার
১৫৭ ওষুধ নির্ঘন্ট
১৬৫ রেফারেন্স

প্রথম অধ্যায়

আরোগ্যের সংকেত

■ ক্যানসার

শরীরের যে কোন কোষের অসামঞ্জস বৃদ্ধিই হল এ রোগের গোড়ার কথা। দ্রুত গতিতে এ বৃদ্ধি আশেপাশে ছড়াতে থাকে। আক্রান্ত কোষগুলোর চারপাশে কোন ক্যাপসুল থাকে না। লসিকাগ্রন্থি ও রক্ত প্রবাহের ভেতর দিয়ে এ রোগ শরীরের নানাস্থানে অতি সত্বর ছড়িয়ে পড়ে। কোষগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এদের নিউক্লিয়াসগুলো অসম্ভব রকমের বড় এবং দেখতে কিম্ভূত-কিমাকার।

■ ইতিহাসের পাতা থেকে

ক্যানসারের সূত্রপাত কবে থেকে হয়েছে, কীভাবে হয়েছে ইত্যাদি তথ্য সঠিকভাবে বলা খুব শক্ত। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় এক দেড় হাজার বছর আগের ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন এক রোগের উল্লেখ রয়েছে যা ক্যানসারের ঠিক অনুরূপ। ওগুলোকে বলা হত দুষ্ট ব্রণ, নাদি ব্রণ, অর্বুদ ইত্যাদি।

খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশ শতাব্দীর মধ্যে মিশরের ফারাওদের মমির হাড়ে সারকোমার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এছাড়া মেডিসিনের জনক হিপোক্রেটিস খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩০ হতে ৩৭৭ তাঁর রোগীদের মধ্যে ক্যানসার জাতীয় টিউমারগ্রস্ত ব্যাধির অস্তিত্ব ধরতে পেরে গরম লোহার শলাকা বা গরম তেল ঢেলে তা পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিতেন।

লিউনিডেস ২০০ খ্রীস্টাব্দে ক্যানসারের চিকিৎসা করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

■ ক্যানসারের প্রকৃতি

ক. এটি এক ধরনের টিউমার যা গতিময় ও খুব তাড়াতাড়ি আক্রান্ত মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

খ. ইনফিলট্রেশন পদ্ধতির দ্বারা এটি অতি সত্বর শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়াকে বলে মেটাসট্যাসিস।

গ. একে উপড়িয়ে ফেললে আবার হয়ে যায়।

ঘ. ঘা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা।

ঙ. রক্তহীনতা ও ক্যানসেরাস ধাতু তৈরি করে।

চ. কোষের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন। এবং সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের অনুপাতের ব্যাপক রদবদল।

ছ. পোলারিটির অভাব। আশেপাশের কোষের সঙ্গে কোন সমতা নেই। এলোমেলো বৃদ্ধি।

জ. এতে, প্রাপ্তবয়স্ক কোষ পরিবর্তিত হয়ে ভ্রূণ কোষের আকার ধারণ করে। আর এই পরিবর্তন অপরিবর্তনীয়।

■ ক্যানসারের লক্ষণাবলী

ক. সাধারণ লক্ষণ —

১. শীর্ণতা ২. ওজন হ্রাস ৩. নিদ্রাহীনতা ৪. শারীরিক ও মানসিক কাজে অনীহা ৫. মৃত্যুভয় ৬. আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশা।

খ. স্থানীয় লক্ষণ—

১. যে কোন জায়গার টিউমার ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়।
২. প্রথমে ওই টিউমারকে নড়ানো যায় কিন্তু পরে তা স্থির হয়ে যায়। তখন আর নড়ানো যায় না।
৩. ল্যারিংস আক্রান্ত হলে লাগাতার গলাভাঙা।
৪. ফুসফুসে আক্রমণ হলে বুকে অস্বস্তিভাব, কাশি, ভারী ভারী ভাব এবং শাসকষ্ট।
৫. মলদ্বারের ক্যানসারে কোষ্ঠবদ্ধতা ও শেষে পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়।
৬. পাকস্থলীর রোগে— খালি পেট ও খাওয়ার পর কোন সময়েই স্বস্তি থাকে না।
৭. লিভার প্রদেশে ব্যথা, জনডিস, লিভার বড় ও শক্ত হয়ে গেলে বুঝতে হয় যে লিভারের ক্যানসার হয়েছে।
৮. যোনিদ্বার দিয়ে অনবরত রক্তস্রাব ও সাদাস্রাব, বিশেষ করে রজঃনিবৃতির পর সেটা ইঙ্গিত দেয় জরায়ুর ক্যানসারের।
৯. আঁচিল, জড়ুল প্রভৃতির হঠাৎ পরিবর্তনশীলতা।
১০. কোন ঘা কোনক্রমেই সারছে না।

■ ক্যানসারের বৈশিষ্ট্য[১]

১. চিকিৎসা না করালে মৃত্যু অনিবার্য।
২. সময়মতো চিকিৎসার প্রবর্তনও একান্ত দরকার।
৩. সামান্যতম লক্ষণ অনেক অনুরূপ অন্য লক্ষণের ভেতর পৃথক করা বেশ কঠিন। চিকিৎসা না করালে বা ওতে বিলম্ব হলে বিপদ ঘটে। কিন্তু সত্বর চিকিৎসা শুরু করলে অনেক রোগীকেই সুস্থতার পথে নিয়ে যাওয়া যায় কিংবা আরোগ্য করা যায়।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের বৈশিষ্ট্য হল— ক. পার্শ্ববর্তী কোষে এর আক্রমণ ও বিস্তৃতি, খ. আক্রান্ত অংশটিকে তুলে ফেলার পরও এর পুনরাক্রমণ, গ. এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়।[২]

---

১. রস ওয়াল্ট এস ঃ আশু ক্যানসার নির্ণয় অনেকের জীবন রক্ষায় সক্ষম ঃ চিকিৎসা জগৎ, ৪১ বর্ষ, পৃ: ৩৩৩।

২. The essential features of a malignant tumour are the tendency to invade neighbouring parts, recur after removal and to metastasis in different areas.–Warner E. C.: Savill's System of Clinical Medicine : E A Publishers, Lond : Fourteenth Edition, Pp 848-849.

■ আতঙ্কের ঢেউ

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় ক্যানসার গবেষণার নামে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। চারদিকে এখন শুধু ক্যানসার আতঙ্কের প্রবাহ। প্রতি বছর আচমকা অনেকে দু-একটি ওষুধের নাম বলে ও তার ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের কাছে ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ বনে যাচ্ছেন। ক্যানসারের ওষুধ বের করে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্ন এখন অনেকেরই। কিন্তু বাস্তবে এ রোগের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সব গবেষকদেরই এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে—লাগাতার গবেষণায় একদিন অবশ্যই বেরিয়ে আসবে ক্যানসার চিকিৎসার সোজা ও সরল ধারা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মধ্যে হোমিওপ্যাথি একটি। এর দিকেও নজর দেওয়া দরকার। কারণ, এটি প্রাকৃতিক আরোগ্য নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে বিজ্ঞানময়। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়—এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে অনেক ক্যানসার রোগী সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন বা সুস্থতার দিকে এগোচ্ছেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যতগুলো শাখা রয়েছে তার ভেতর কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথি রোগের মৌলিক কারণ মিঅ্যাজমকে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। আসলে মূলের চিকিৎসা না করে শুধুমাত্র রোগফলের চিকিৎসা করলে বিফলতা আসে সবসময়ই। ব্যাপক গবেষণার ফলে জানা যাচ্ছে যে, এই রোগের কারণ বেশিরভাগক্ষেত্রে আরও গভীরে। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, সেলের ভেতর 'ভুল জেনেটিক কোড'-ই এর জন্য দায়ী। আর সেটা বংশানুক্রমিক চলে। যেখানে গিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে ওই 'ভুল কোড', সেখানেই ক্যানসার সৃষ্টি হয়। তাই রোগের ফলকে রোগ বলে ভাবাটা ঠিক নয়। আর এইভাবে চিকিৎসা করলে ফলও ভাল মিলে না।

■ কারণতত্ত্ব

ক. মূল বা ফানড্যামেনটল
খ. উত্তেজক বা এক্সসাইটিং
গ. পরিপোষক বা মেনটেইনিং

■ মূল কারণ

যে কোন রোগ সৃষ্টির মূলে আছে মিঅ্যাজম। মিঅ্যাজম হল রোগ সৃষ্টিকারী এক সূক্ষ্ম পদার্থ। এর প্রভাব না থাকলে কোন রোগ হতে পারে না। তা সে চির অথবা অচির যাই হোক না কেন। হানেমান সাহেব এই মিঅ্যাজমকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। সোরা শুধু জীবনীশক্তির চলন্ত প্রবাহে গন্ডগোল আনে। সিফিলিসের কাজ হল ধ্বংস করা। মনে ও শরীরে যত রকমের অসংলগ্নতা ও অযথা বৃদ্ধি দেখা দেয়—সবই সাইকোসিসের ফল। এছাড়াও হানেমান-পরবর্তী যুগে নানা মিঅ্যাজম-এর আবিষ্কার হয়েছে। তাদের ভেতর টিউবারকুলোসিস, ভ্যাক্সিনোসিস, পেনিসিলিনোসিস, কারসিনোসিস ইত্যাদি প্রধান। তারা একা একা বা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সব রোগ সৃষ্টি করে।

ক্যানসারের প্রধান কারণ সোরার সঙ্গে সিফিলিস বা সাইকোসিসের সংমিশ্রণ। অনেক সময় তিনটে রোগবিষ একত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বনামধন্য ডাঃ রবার্টস বলেন, সোরা একা ক্যানসার সৃষ্টি করতে অক্ষম। কোষের ভেতর নিউক্লিয়াসের বিকট ও কিম্ভূত কিমাকার বৃদ্ধির জন্য সাইকোসিস দায়ী। আর তাড়াতাড়ি আক্রান্ত কোষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য সিফিলিসকে দোষী করা হয়।

১. স্কিরাস জাতীয় ক্যানসারের সৃষ্টি হয় সোরা ও সাইকোসিসের ফলে।

২. কার্সিনোমা মেডালেয়ারের মতো দ্রুত বিধ্বংসী ক্যানসার সৃষ্ট হয় সোরা ও সিফিলিসের মিলনে।

৩. কার্সিনোমা সারকোম্যাটোড জাতীয় ভয়ংকর ক্যানসারের সৃষ্টি সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিসের একত্র সমন্বয়ে।

বেশির ভাগ জটিল রোগ—যাদের আরোগ্য করা খুব কঠিন, তারা তিনটে মিঅ্যাজমের একত্র সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। যেমন—ক্যানসার, সোরিয়াসিস ইত্যাদি।[৩]

তবে ক্যানসারের যে মৌলিক লক্ষণ—কোষের বিবৃদ্ধি, তা সাইকোসিস থেকে জাত। এই মিঅ্যাজম সিংহভাগ অংশ দখল করে রাখে।

ম্যালিগন্যান্ট রোগ যেমন ক্যানসার, কার্সিনোমা, লিউপাস, এপিথেলিওমা এবং ডায়াবেটিস, ব্রাইটস ডিজিজ ও টিউবারকুলোসিস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হবার প্রবণতা সবই সাইকোসিস হতে জাত। ফাইব্রাসের পরিবর্তন যা প্রায়ই ম্যালিগন্যান্সিতে রূপান্তরিত হয়, তা শরীরের অভ্যন্তরের বিশিষ্ট যন্ত্র যেমন জরায়ু, কিডনি, লিভার, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিকেও আক্রমণ করে।[৪]

ক্যানসার প্রকৃতিগত কারণ ছাড়া হয় না। এর মৌলিক কারণ হচ্ছে বংশানুক্রমিক এক প্রকার ধাতুগত দোষ। প্রতিটি মানুষের সুস্থ কোষের কেন্দ্রে ৪৬টি করে ক্রোমোজোম থাকে। আর ওইসব ক্রোমোজোমে জীনস Genes বর্তমান। এই জীনস হল বংশ রক্ষার বীজ। এগুলি মানুষের শরীরে অসংখ্য। এরা মা-বাবা থেকে সন্তানে বর্তায়। তাই বলা যায় আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের ক্রোমোজোমে বর্তমান।

মানুষের শরীরে যদি কোন রোগ হয় তবে দেহের প্রতিটি কোষ কম-বেশি আক্রান্ত হয়। অসুস্থ হয় গোটা মানবসত্তা। আর ওই অসুস্থ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যে সন্তান জন্মায় সে অবশ্যই একপ্রকার ধাতুগত দোষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর ওইসব ধাতুগত দোষের ফলেই ক্যানসারের মতো রাক্ষসী রোগের উৎপত্তি।

বলা যেতে পারে, ক্যানসার সৃষ্টির জন্য কার্সিনোসিস নামক মিঅ্যাজমই একমাত্র দায়ী। এটি একটি যৌগিক মিঅ্যাজম।

---

৩. Some of the most complicated diseases, difficult to cure, represent the combination of all the three Miasms e. g Cancer, Psoriasis etc. –Dhawale M. L. : Principle & Practice of Medicine, P-447.

৪. When I speak of malignancies I refer to cancer, carcinoma, lupus, epithelioma.....may be developed from the sycotic taint ..... especially if internal organ like the uterus, kidney, liver & heart are involved—Allen J Henry : The Chronic Miasm : Jain Publishing Co., New Delhi, P-65.

■ বংশগত প্রবাহ

কোন কোন বংশে এ রোগ পর পর চলতেই থাকে। আসলে মিঅ্যাজম-এর হাত জিন নামের অতি সূক্ষ্ম বস্তুকেও আক্রমণ করে ফেলে। যার ফলে পরবর্তী বংশধরেরা, ক্রমাগত আক্রান্ত হয়। নেপলিয়ন বোনাপার্ট এমনই এক বংশের সন্তান যে বংশে ক্যানসারের এক স্রোত চলছিল।

যদি কোন স্ত্রীলোক স্তনের ক্যানসারে ভোগেন—তাও জীবনের প্রথম দিকে, তাহলে ওই বংশের মেয়েদের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি হয়। রেটিনোব্লাসটোমা নামক ক্যানসারের ক্ষেত্রেও তাই। এমনকি পেট, ফুসফুস ও চামড়ার ক্যানসারও চলে বংশগতভাবে। আমার অভিজ্ঞতায় এইসব হতে আমি দেখেছি, বিশেষ করে স্তন ক্যানসার।

যে কোন ক্রনিক রোগ বংশগতভাবে প্রসার লাভ করে। আজ কোন মানুষের একটি ক্রনিক রোগ হল। তা যদি ঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারা না যায়, তবে তার বংশধরদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কমবেশি এই রোগ কিংবা ওই জাতীয় রোগে ভোগার সম্ভাবনা বেশি।

একথা সত্য যে, অসুস্থ লোকের ছেলেপুলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসুস্থই হয়। কোন কোন সময় যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না, তা নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবা হতে জাত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল।

বর্তমানে যেসব বিকট বিকট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ, তার মূল কি সবসময় নিজের অর্জিত রোগেরই ফল? অবশ্যই নয়। আর ক্যানসার তো প্রকৃতিগত কারণ ছাড়া হয়ই না।

বাবার সুস্পষ্ট ক্যানসার এবং মায়ের অপেক্ষাকৃত কম, বা মোটেই ক্যানসার না থাকলে ছেলেমেয়েদের ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা কম। অন্যদিকে মায়ের সুস্পষ্ট ক্যানসার এবং বাবার অপেক্ষাকৃত কম বা না থাকলে ছেলেমেয়েদের ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। ক্যানসার ট্রানসমিশনে মা-ই একমাত্র বাহন।[৫]

■ চাপা দেওয়ার কুফল

ক্যানসার সৃষ্টির মূলে যতগুলো উত্তেজক কারণ রয়েছে তার ভেতর চাপা দেওয়া চিকিৎসা অন্যতম। প্রকৃতির নিয়ম হল— রোগের গতিকে ভেতর থেকে বাইরের দিকে ঠেলে বের করা। এই বহির্মুখী গতি মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

সাধারণত দেখা যায় প্রথমে শরীরের কোন মূল্যবান যন্ত্র আক্রান্ত হয় না। কিন্তু নানা চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফলে রোগের বহির্মুখী গতি ক্রমান্বয়ে অন্তর্মুখী হয়ে যায়। ক্ষত-বিক্ষত হয় জীবনীশক্তি। আর এর প্রভাব পড়ে নানা মূল্যবান অঙ্গ আক্রান্ত হয়ে। যেমন—হার্ট, ফুসফুস, লিভার, ব্রেন ইত্যাদি।

---

৫. The offspring of a cross of a high Cancer father and a low Cancer mother have low incidence of Cancers. A high Cancer mother and low Cancer father on the other hand, produce high Cancer incidence in offspring. The mother in short is the sole effective transmitter of the lesion.–Dey N C & Dey T K, A Text Book on Pathology, Allied Agency, Calcutta, 1981, Page – 129.

বারেবারে এইভাবে চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফলে এমন এক বিপ্লবের লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে যার দাপটে রোগ নয়, রোগীটাই শেষ হয়ে যায়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে ক্যানসারের মতো এত জটিল রোগ একদিনে হুট করে উড়ে এসে জুড়ে বসে না। এই উৎকট রোগে পৌঁছানর আগে অনেক বড় ইতিহাস থাকে। তার ভেতর চাপা দেওয়া চিকিৎসা অন্যতম। অহোমিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় চিকিৎসার মাধ্যমেই রোগকে চাপা দেওয়া যায়।

যে কোন রোগকে চাপা দিতে গেলে তার ফলে উদ্ভূত হয় নানা উপসর্গ। যা মূল রোগের লক্ষণ থেকেও অনেক সময় কষ্টকর হয়।

যে চিকিৎসা-পদ্ধতি মূল রোগের চিকিৎসা করে বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে তাকে প্রকৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি বলে না। প্রকৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি তাকেই বলে—যে মূল রোগকে দূর করে কিন্তু কোন উপসর্গ সৃষ্টি করে না।[৬]

সোরাকে সমস্ত মিঅ্যাজমের মূল মনে করা হয়। এর বাহ্যিক লক্ষণ চুলকোনি। কোন মানুষের এই চুলকোনি হলে একে নেহাত চামড়ার রোগ মনে করে নানা রকম ওষুধ মলম ইত্যাদি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। তখনই সোরার চলন্ত প্রবাহে গণ্ডগোল শুরু হয়। ফলে জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক চলমান ধারা ব্যাহত হয়।

এই বিকৃত সোরা মানুষের যৌন উত্তেজনাকে অনেক সময় সীমাতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয় ও মনকে নীচ করে তোলে। ফলে মানুষ অস্বাস্থ্যকরভাবে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। সৃষ্টি হয় সিফিলিস ও গনোরিয়া নামক রোগ। তারপর সেইসব রোগকে চাপা দিয়ে শরীরে সিফিলিস ও সাইকোসিস নামক মিঅ্যাজমের বীজ বপন করা হয়। চিরকালের জন্য।

ওইসব মিঅ্যাজম-পূর্ণ মানবসত্তা যখন অ-হোমিওপ্যাথিক অথবা অপ-হোমিওপ্যাথিক পন্থায় চিকিৎসিত হয়, তখনই এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় দেহ মনে। এই অবস্থায় যদি তাদের কোন সন্তান জন্মলাভ করে, তবে সেই শিশু ক্যানসারের ধাতু প্রকৃতি নিয়ে জন্মাতে পারে। তখনও চাপা দেওয়া চিকিৎসার চেষ্টা চললে। আর তার ফল হয় বিষময়।

সুস্থ জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে তখন। এবং তা নিয়ে চলতে থাকে জীবনের বাকী অধ্যায়। কষ্টকরভাবে।

আমেরিকার বিখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ও বহু ক্যানসার রোগী আরোগ্যকারী চিকিৎসক ডাঃ এলি জি জোন্স বলেন—

I honestly believe that if it were possible to keep the vitality of a person at or near the healthy standard, there would be no danger of cancer.

মর্মার্থ ঃ *জীবনীশক্তিকে যদি সবল ও সুস্থ রাখা সম্ভব হয়, তবে ক্যানসারের কোন বিপদ থাকে না।*

---

৬. The course of treatment which cures the orginal disease but produces some other kind of complication is not correct line of treatment ; the correct one is that which cures but does not provoke any other. — Charaka : Nidana — 823.

■ উত্তেজক কারণ

১. অসংযত জীবনযাপন ও ভেজাল খাদ্য।
২. তেজস্ক্রিয় রশ্মির পুনঃ পুনঃ অপব্যবহার।
৩. আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, এক্সরে ও সূর্যরশ্মি।
৪. প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে সার প্রয়োগ।
৫. এক রকমের প্যারাসাইট।
৬. অতিরিক্ত ধূমপান কিংবা পান দোক্তা খইনি ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার।
৭. অতিরিক্ত মদ্যপান।
৮. জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্যে নানা কৃত্রিম পদ্ধতি ও ওষুধ প্রয়োগ।
৯. বারবার বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে গর্ভস্রাব করা।
১০. দীর্ঘদিন কোন জায়গায় আঘাত, ঘর্ষণ ও তাপলাগা।
১১. যৌন হরমোন, যেমন ইসট্রজেন, এফ. এস. এইচ., টি. এস. এইচ. ও ডি-অক্সিকোলিক এসিডের প্রাবল্য।
১২. লাগাতার মানসিক দুশ্চিন্তা।
১৩. ভ্যাক্সিনেশন।
১৪. অতিরিক্ত মাত্রায় মাংস ও ডিম খাওয়া।
১৫. কেমিক্যাল— ক) পলিসাইক্লিক হাইড্রকার্বন— ১ ঃ ৫ ঃ ৬ ডাইবেনজানথ্রাসিন।
খ) আজো কম্পাউণ্ডস—সারলেটরেড।
গ) প্যারাডাইমিথাইল—অ্যামাইনো এজো বেনজিন।
ঘ) ন্যাপথেলিমিন—২—ন্যাপথেলিমিন এবং অন্যান্য এরোমেটিক এমিনস।
ঙ) আর্সেনিক।

■ কোষের ওপর কারসিনোজেনের প্রভাব ঃ

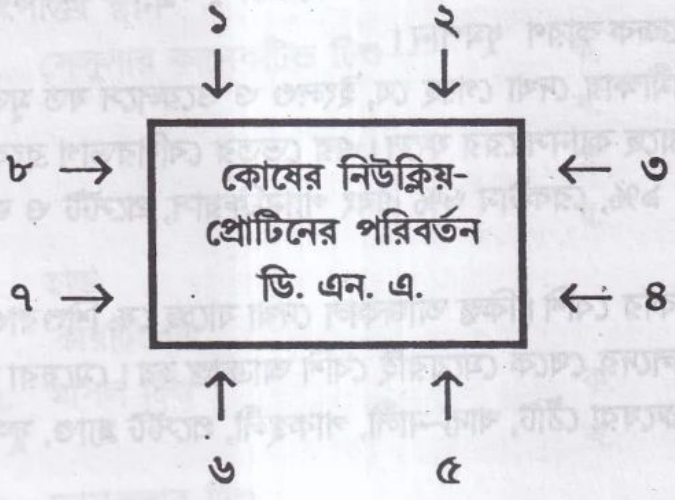

১ = বংশ-প্রবাহ (জিনের পরিবর্তন)
২ = পলিসাইক্লিক হাইড্রকার্বন
৩ = এজোডস
৪ = রেডিয়েশন (আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, এক্সরে ইত্যাদি)
৫ = পুরনো উত্তেজনা
৬ = ভাইরাস
৭ = হরমোন
৮ = বেড়ে ওঠা সেল রেন্ট।

■ পরিপোষক কারণ

ক. বিভিন্ন আবহাওয়া ও জাতি
খ. বয়স
গ. লিঙ্গ

দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ও পরিবেশে মানুষের যেমন নানা অসুখ দেখা যায়, ঠিক তেমনই ক্যানসারও নানা জায়গায়, নানা পরিবেশে নানা ধরনের হয়। দেখা গেছে, কোপেনহেগেনের গরিব মানুষদের মধ্যে পুরুষরা ফুসফুস ও মেয়েরা জরায়ুর ক্যানসারে ভোগে বেশি। ইংলণ্ডের ডক কর্মীদের ঠোঁট ও মুখের ক্যানসার বেশি হয়। যারা রাসায়নিক কারখানায় কাজ করে তাদের চামড়ার ক্যানসারের আধিক্য। এমনকী যারা সূর্যের তাপে কাজ করে তাদেরও চামড়ার ক্যানসার দেখা যায়।

গায়করা বেশির ভাগ কণ্ঠনালীর ক্যানসারে ভোগে। এমনকী নানা পরিবেশ, নানা জাতিতে, নানা পেশায় ক্যানসার আক্রমণের ধরন আলাদা।

ব্রংকাসের ক্যানসার এখন খুবই সাধারণ। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রতি বছর এই ক্যানসারের গতি বাড়ছে। ১৯১১—১৯১৯ সালে ২৫০ জন, ১৯৫০ সালে ১২২৪১ জন এবং ১৯৬২ সালে ২৩৭৭৪ জন। প্রতিবছর ৮% হারে এই রোগ বাড়ছে। ফুসফুস ও ব্রংকাসের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান উত্তেজক কারণ ধূমপান।

১৯৫৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যত মৃত্যু হয়েছে তার শতকরা প্রায় ১৮% মৃত্যু হয়েছে ক্যানসারের ফলে। এর ভেতর বেশিরভাগ ব্রংকাস ও ফুসফুস ১৪%, পাকস্থলী ১৪%, স্তন ৯%, রেকটাম ৬% এবং প্যানক্রিয়াস, প্রস্টেট ও জরায়ু প্রত্যেকে প্রায় ৪% করে।

বয়স্করা এ রোগের শিকার বেশি। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে, শিশুরাও কোন অংশে কম যায় না। এই রোগে ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি আক্রান্ত হয়। মেয়েরা সাধারণত স্তন ও জরায়ুর ক্যানসার এবং পুরুষেরা ঠোঁট, খাদ্য-নালী, পাকস্থলী, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদির ক্যানসারে বেশি ভোগে।

■ দেহের বিভিন্ন অংশের ক্যানসার ঃ

অঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রী
মুখ	৫·৩%	১·২%
শ্বসন যন্ত্র	১১·৯%	৩·২%
যৌন অঙ্গ	১২·৬%	২৪·৯%
ত্বক	২·৫%	১·৫%

অঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রী
স্তন		১৮·২%
পাচক তন্ত্র	৫১·৫%	৪০%
মুখ যন্ত্র	৬·৩%	৩·৩%
অন্য অঙ্গ	৯·৯%	৭·৭%

■ ক্যানসারের বিভিন্ন ধাপ

ক. প্রাথমিক বা প্রিক্যানসেরাস স্টেজ—এই ধাপে নানারকম লক্ষণ আসে। যেমন—অনিদ্রা, মাথা ঘোরা, চুল উঠে যাওয়া, অল্প বয়সে দাঁত ওঠা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, যখন তখন মাথাব্যথা, একটুতেই সর্দি, পেটের গণ্ডগোল, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতের কামড়, হাত-পা কাঁপা, তোতলামি, লিভার ও প্লীহার বৃদ্ধি।

আস্তে আস্তে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে চলে যায়। যেমন—দুরারোগ্য মাথাব্যথা, দুরারোগ্য জ্বর, দুরারোগ্য অজীর্ণতা, চর্মরোগ, অধিক মাসিকস্রাব, সাদা স্রাব, এনজিনা পেকটোরিস, চোখের ছানি, রক্তের চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

খ. পরিপূর্ণ বা ক্যানসেরাস স্টেজ—এবার চলে আসে এমন এক নিদান অবস্থা, যার নাম শুনলেই বাঁচার সাধ থাকলেও হৃৎপিণ্ডের কাজ যেন থমকিয়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর মতো এক কঠিন বাস্তব। তারপর সব শেষ।

■ ক্যানসারের শ্রেণীবিন্যাস

উৎপত্তির স্থান		নাম
১. সেলুলার কানেকটিভ টিশু—	ক.	সারকোমা
	খ.	ফাইব্রো-সারকোমা
	গ.	মিকেসা-সারকোমা
	ঘ.	লাইপো-সারকোমা
হাড়		অস্টিও সারকোমা
কারটিলেজ		কনড্রো সারকোমা
২. মাসল টিশু	ক.	লিমারো-সারকোমা
	খ.	র‍্যাবডোমা সারকোমা
৩. ভাসকুলার টিশু		এনজিও সারকোমা